বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষি ওরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ খ্রিস্টান পল্লী মেহেরপুরের মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর-এর আম্রকাননে শুধু একটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি; সেখানে ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত, নিঃশব্দ শ্রম আর সাধারণ মানুষের অসাধারণ অংশগ্রহণে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ একটি দিন, একটি দৃশ্য, একটি নিঃশব্দ প্রত্যয়ের নাম। মুজিবনগর-এর সেই বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন আজও যেন বাতাসে বহন করে সেই গোপন প্রস্তুতির গন্ধ, গ্রামবাসীর নিঃশব্দ সাহসের প্রতিধ্বনি। সকালের রোদ তখন নরম। আমগাছের ছায়া মাটিতে ছোপ ছোপ আলো ফেলেছে। ১৩ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকানন-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো এই নীরবতা কখনোই নিছক নীরব ছিল না। ১৯৭১-এর সেই দিনটিতে, এই মাটিই ছিল উত্তাল ইতিহাসের কেন্দ্র।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পপথ গ্রহণ করেন। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে বিলুপ্তি হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি অংশ না নিলেও, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সরকার গঠন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে পারতো না। তাদের ভূমিকা ছিল সমর্থন, সহানুভূতি, নিরাপত্তা, এবং সরবরাহ সংক্রান্ত সহায়তায়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য যেকোনো ধরনের প্রস্তুতির জন্য গ্রামবাসীরা সহায়তা করেছিলেন। যেমন- মঞ্চ নির্মাণ, অতিথিদের জন্য স্থান তৈরি, খাবার এবং পানীয় সরবরাহ, অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তারা এই কাজগুলো নিজেরাই করেছিলেন।

সূর্য সেদিন ছিল নির্মম। বৈশাখের খরতাপ যেন মাটিকেও দগ্ধ করছিল। সূর্যও যেখানে মুজিবনগর আম্রকাননকে কুর্ণিশ করে। সেই মুজিবনগর আম্রকানন-এর গাছের ছায়াও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই তাপদাহ উপেক্ষা করেই ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। সেদিন মেহেরপুরের ১২ জন আনসার সদস্য। সাধারণ পোশাকে, কিন্তু চোখে কঠোর দৃঢ়তা। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, সামরিক

কায়দায় অভিবাদন জানান নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার-কে।

দেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব হোসেন বলেনÑ আমাদের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বড় ভূমিকা ছিল। ১৬ এপ্রিল জাতীয় নেতারাসহ ভারত সরকারের উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন মুজিবনগরে এসে স্থান নির্ধারণ করে যান। অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সফল করার দায়িত্ব ছিল বিএসএফের। ১৭ এপ্রিল কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের একত্রিত করে বিশাল গাড়ী বহর নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সবাই মুজিবনগরে হাজির হয়েছিল। সেদিন মুজিবনগরের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতনা।

সংগ্রাম কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দোয়াজ আলী বয়সের ভারে হাঁপিয়ে উঠেছেন। স্মৃতি হাতড়ে জানান- সেদিন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গোলক মজুমদার, নদীয়ার জেলা প্রশাসক মি. মূখার্জি এবং বিএসএফের ৭৬ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে: কর্ণেল চক্রবর্তী দুজনে সাদা পোশাক পরে আসেন। আমি সংগ্রাম কমিটির সভাপতি জেনে মুজিবনগর আমবাগানের একটি স্থানকে চিহ্নিত করে একটি তোরণসহ মঞ্চের চর্তুরদিক বাঁশ দিয়ে ঘেরার নির্দেশ দিয়ে ফিরে গেলেন। তখনও জানিনা তারা এখানে কিসের অনুষ্ঠান করবে। নির্দেশমত এলাকার বিভিন্ন বাড়ি থেকে চৌকি, কাপড়, দড়ি, ঝাঁড় থেকে বাঁশ এবং দেবদারুর পাতা এনে স্থানীয়দের সহায়তায় তৈরী করা হয় তোরণ ও বড় মঞ্চ। সারারাত ধরে এই কাজ করা হয়। খুব সকালে তারা এখানে আসলে দেখেন ভারতীয় হেলিকপ্টার আকাশে মহড়া দিচ্ছে। এরপরপরই মুজিবনগর সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে অসংখ্য জীপ ও ট্রাক ঢুকতে শুরু করে। এই সমস্ত গাড়ি করে জাতীয় নেতারাসহ বিদেশী সাংবাদিক ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা আসেন। বিএসএফ পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ার, মাইক, টেবিল সবই আসে ভারত থেকে। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাধারণ জনতাকে যে মিষ্টি ও পাউরুটি দেয়া হয়েছিল সেটাও এসেছিল ভারত থেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় খ্রিস্টান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পাঠ করা হয় ধর্মগ্রন্থ। ইতিহাসের সূত্রে জানা যায়, এক হিন্দু ভদ্রলোক গীতা পাঠ করেন- যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের এক প্রতীকী ঘোষণা। এরপর বাজে জাতীয় সঙ্গীত- “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’। কণ্ঠে হয়তো ছিল কম্পন, কিন্তু সেই সুরে ছিল স্বাধীনতার দৃঢ় অঙ্গীকার। সেদিন

গানটা ছিল বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক বাকের আলী সেই শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেছিলেন। তিনি জানান, সেদিন খুব সকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগরে উপস্থিত হন। তিনি তাদের চিনতেন না। স্থানীয় নেতাদের সাথে তিনি জাতীয় নেতাদের সন্মুখে গেলে অনুষ্টানে তাকে কোরআন তেলোয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ তার নাম লিখে নিলেন এবং রিহার্সালের সময় তেলোয়াত শুনলেন। মাত্র ৩০ মিনিট অনুষ্ঠানটির স্থায়ীত্ব থাকলেও উপস্থিত সকলের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার উম্মাদনা ও জীবনবাজির শপথ।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়েছিলেন মেহেরপুরের ১২জন আনসার সদস্য। ইতোমধ্যে ১০ জন মারা গেছে। বেঁচে আছেন দুইজন। এদেরই একজন বয়োবৃদ্ধ মো. সিরাজ উদ্দীন। প্রতিদিন তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আসেন। তিনি বলেন- সেদিন আমাদের ডাক পড়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে রাস্ট্রিয় মর্যাদায় সালাম জানানোর। আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। ওইদিনই ট্রেনিং দিয়েছিলেন তৎকালীন ঝিনাইদহের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) মাহবুব উদ্দীন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা গার্ড অব অনার দিই সরকারকে। আর এক আনসার সদস্য আজিম উদ্দীন বলেন- তখন আনন্দ ভয় উত্তেজনা কাজ করছিলো। দেশি বিদেশী সাংবাদিকসহ হাজারো মানুষের সামনে প্রথম সারকারকে সালাম জানানোর সময় মনে যে প্রশান্তি পেয়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবেনা। পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

প্রত্যক্ষদর্শীর সুভাষ মল্লিকের ভাষায়- ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ছিল না, কিন্তু যে ভঙ্গিতে সালাম দিল- মনে হচ্ছিল এটাই স্বাধীন দেশের প্রথম সেনাবাহিনী। সেই অভিবাদন ছিল প্রতীকী, কিন্তু তা-ই হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সূচনালগ্নের প্রতিচ্ছবি।

মুজিবনগর স্মৃতিপ্রকল্প এলাকায় দেখা মেলে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী আহম্মদ খাঁ (৭১) রিক্সা ভ্যানে করে শষা ফেরি করছেন। তিনি বলেন- সে বছরই আমার বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন হঠাৎ করেই হাজার মানুষ জড়ো হলো মুজিবনগরের এই আমবাগানে। তখন বাগানটি ভাগাড় হিসেবে গ্রামের মানুষ ব্যবহার করতো। সেদিন আমিসহ একদল যুবক বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি সংগ্রহ করে

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□-□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□; □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□- □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□- □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□Ñ □□□□ □□□□□, □□□, □□□□Ñ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□- □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□

□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

বলতে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনাই ছিল একমাত্র স্বীকৃতি। ২০২৪ সালের পর সেই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনাও বন্ধ হয়ে গেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু বলেন, এত বছরেও ভাষাসংগ্রামীদের রাষ্ট্রীয় তালিকা হয়নি। তাঁদের পরিবারগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়ারও কোনো উদ্যোগ নেই। এটি ইতিহাসের প্রতি অবহেলা।”

মেহেরপুরের ভাষাসংগ্রামীদের নাম আজও কোনো সরকারি পূর্ণাঙ্গ তালিকায় নেই। তাঁদের অনেকেই প্রয়াত; পরিবারগুলোও অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সম্মাননা কিংবা আর্থ-সামাজিক সহায়তার বিষয়টি অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করা জাতির জন্য এটি এক বেদনাদায়ক প্রশ্ন। প্রান্তিক শহরের যাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন, গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-পরিচয় কি ইতিহাসের প্রান্তেই পড়ে থাকবে?

মেহেরপুরের সচেতন মহল মনে করে, অবিলম্বে ভাষাসংগ্রামীদের যাচাই-বাছাই করে রাষ্ট্রীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি। নইলে প্রান্তিক এই শহরের অবদান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে- আর ইতিহাস হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ।

পানাম সিটি: বাংলার ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী

গতকাল রোববার দিনের সিংহভাগ সময় কাটালাম নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত প্রাচীন শহর পানাম সিটিতে। পানামা যেন হারিয়ে যাওয়া এক গৌরবগাথার জীবন্ত স্মৃতি। ইতিহাস, স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই শহরটি আজো দাঁড়িয়ে আছে শ শ বছরের পুরনো অনেক গল্প নিয়ে।

১৫শ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই নগরী মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সুলতানি ও মুঘল আমলে সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী, আর পানাম ছিল সেই রাজধানীর গৌরবময় আবাসভূমি। বিশেষ করে হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্যে গড়ে ওঠা পানাম নগরীতে ইউরোপীয়, মুঘল ও বাংলা স্থাপত্যরীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়।

বর্তমানে পানাম নগরীতে প্রায় ৫২টি ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিই একেকটি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। সড়কের দু’পাশে সারি সারি দালান যেগুলোর দেয়ালে আজও জেগে আছে পুরোনো দিনের কারুকাজ, রঙিন কাচের জানালা, কাঠের ফ্রেম আর চুন-সুরকির প্রাচীন প্রযুক্তির ছাপ। জমিদারের ৫ শ মিটার পুকুর। পুকুরে অনেকগুলো গোসলের জন্য সানবাঁধানো সিঁড়ি। সেই সময়ের সুপেয় পানির বেশ কটি পাকা কুয়া। কালের সাক্ষি হয়ে পড়ে আছে পাকা পায়খানা।

সংস্কারহীনতায় হারাতে বসেছে সেসব ঐতিহ্য।

যদিও ২০০৬ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পানাম সিটিকে “সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান” হিসেবে ঘোষণা করেছে, বাস্তবতা হলো অনেক ভবন আজ ধ্বংসপ্রায়। অবহেলা, যথাযথ সংরক্ষণের অভাব এবং পর্যটন চাপে এই ঐতিহ্যবাহী স্থানটি হুমকির মুখে পড়েছে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় অনেক ভবন ধসে পড়েছে। বৃষ্টির মৌসুমে পানিতে ভিজে কাঠ ও চুন-সুরকির দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটন ও স্থানীয় দখলদারদের কারণে ঐতিহাসিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

পানাম নগরী বর্তমানে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এখানে ভিড় করেন ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু পর্যাপ্ত গাইড, তথ্যচিত্র, পর্যটক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ঘাটতি দেখলাম।

পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে পানাম সিটি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সফল হেরিটেজ ট্যুরিজম স্পট।

কেয়ার টেকার রফিকুল ইসলাম জানালেন-পানাম সিটি শুধু একটি পুরনো শহর নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই নগরীর দেয়ালে লেগে আছে বাঙালি জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ছাপ। প্রয়োজন এখন শুধু সময়োচিত উদ্যোগ, সচেতন সংরক্ষণ এবং সম্মিলিত

দায়িত্ববোধ।

পানামকে যদি সময়মতো বাঁচানো যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারবে-নয়তো এটি হারিয়ে যাবে কালের অতলে, আর আমরা হারাবো এক অপূর্ব ঐতিহ্য।

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশর ইতিহাস

প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এবার দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তানকে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করলো টাইগাররা। স্বাগতিকদের ৬ উইকেটে হারিয়েছে নাজমুল হাসান শান্তর দল। এ নিয়ে বিদেশের মাটিতে তৃতীয়বারের মতো টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে লিটন দাসের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ২৬২ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ১২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দুই টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার বোলিং তোপে ১৭২ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৮৫ রান।

পাকিস্তানের দেওয়া ১৮৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রান সংগ্রহ করে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। দুই টাইগার ওপেনার জাকির হাসান ২৩ বলে ৩১ ও সাদমান ইসলাম ১৯ বলে ৯ রানে অপরাজিত থেকে পঞ্চম দিনে খেলতে নামে। দিনের শুরুতেই দলীয় ৫২ রানে সাজঘরে ফিরে যান জাকির। ৩৯ বলে ৪০ রান করেন তিনি।

জাকিরের বিদায়ের পর দলীয় ৭০ রানে ৫১ বলে ২৪ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার সাদমান। এরপর ক্রিজে আসা মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে দিনের শুরু ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন শান্ত।

দেখেশুনে খেলতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়েন শান্ত। তবে দলীয় ১২৭ রানে ৮২ বলে ৩৮ রান করে

সাজঘরে ফিরে টাইগার অধিনায়ক। এরপর মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন মুমিনুল।

তবে দলীয় ১৫৩ রানে ৭১ বলে ৩৪ রান করে আউট হন মুমিনুল। তার বিদায়ের পর সাকিব আল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন মুশফিক। ৫৬ ওভারে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই দুই ব্যাটার। মুশফিক ৫১ বলে ২২ ও সাকিব ৪৩ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক